লবণাক্ততা গবেষণা

বন্যা, খরা, জলচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনে অন্যতম বাধা। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের বিরাট একটা অংশের মাটি লবনাক্ততায় আক্রান্ত হবে যা উপকূলীয় এলাকায় ফসল চাষের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

মাটির লবণাক্ততা ফসলের স্বাভাবিক উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। মাটির লবণাক্ততার সমস্যা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের কৃষি বিজ্ঞানীদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি বাংলাদেশের কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর বিজ্ঞানীরা মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার কৌশল নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

বাংলাদেশের উপকূলবর্তী প্রায় ৫৩% অঞ্চল লবণাক্ততা দ্বারা সরাসরি আক্রান্ড় । বর্তমানে দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল ছাড়িয়ে এই লবণাক্ততা আক্রান্ড় অঞ্চল ক্রমেই বেড়ে চলেছে । মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর ২০০৯ সালের লবণাক্ততা জরিপের তথ্য মতে, বাংলাদেশের প্রায় ১.০৫৬ মিলিয়ন হেক্টর চাষযোগ্য জমি (যা উপকূলের মোট চাষযোগ্য জমির ৬৩%) বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা দ্বারা আক্রান্ড় ।

ইতোমধ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র (বটিয়াঘাটা, খুলনা)-এর বিজ্ঞানীরা লবণাক্ত এলাকায় ফসল উৎপাদনের কয়েকটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন যা কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩ টি প্রযুক্তি হচ্ছেঃ

১। কলস সেচ পদ্ধতি

২। খামার পুকুর পদ্ধতি

৩। দুই স্তর মালচিং পদ্ধতি

কলস সেচ(Pitcher Irrigation)প্রযুক্তিঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৮টি জেলার ৯৩টি উপজেলা বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততায় আক্রান্ড়। লবণাক্ততার কারণে এই এলাকার শস্য নিবিড়তা মাত্র ১৩৩ শতাংশ। শুকনো মৌসুমে এই এলাকার অধিকাংশ জমি পতিত থাকে। কোনও কোনও এলাকায় সীমিত আকারে তিল বা মুগডালের চাষ হয়।আবার দেরিতে পানি অপসারনের কারনে সময়মতো তিল বা ডালের বপন করা সম্ভব হয় না। দেরিতে তিল, ডালের বপনের ফলে তিল, ডাল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই বর্ষার পানিতে তা নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে এই এলাকায় শুকনো মৌসুমে নিরাপদ পানির (লবণমুক্ত) অভাবে আমন ধানের পরে বোরো ধান চাষও সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে বিরাট একটি এলাকা পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে। এই অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র লবণাক্ততা কবলিত এলাকায় শুকনো মৌসুমে ফসল চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করে চলেছে। সম্প্রতি এই গবেষণা কেন্দ্র হতে উদ্ভাবিত একটি প্রযুক্তির নাম “কলস সেচ (চরঃপযবৎ ওৎৎরমধঃরড়হ)” প্রযুক্তি।‘কলস সেচ’ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় শুকনো মৌসুমে ফসল উৎপাদন করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

কলস সেচ (চরঃপযবৎ ওৎৎরমধঃরড়হ) প্রযুক্তির উদ্দেশ্যঃ

- মাটির লবণাক্ততার মাত্রা কমিয়ে ফসল চাষ
- অল্প পরিমানে সেচের পানি ব্যবহার করে মাদা ফসল (কুমড়া,তরমুজ, উচ্ছে, ঝিংগা ইত্যাদি) উৎপাদন
- সেচের পানির অপচয় রোধ ও সুষম ব্যবহার
- উদ্ভিদের খাদ্য উপাদান গ্রহনে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা

]কলস সেচ (Pitcher Irrigation) প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র সমূহ

- কলস সেচ প্রযুক্তি শুধুমাত্র মাদা ফসল যেমনঃ কুমড়া,তরমুজ,উচ্ছে,ঝিংগা ইত্যাদির জন্য উপযোগী
- যেসব এলাকায় শুকনো মৌসুমে নিরাপদ পানির পর্যাপ্ত উৎস থাকে না।
- যেসব এলাকায় পানি সেচের জন্য শ্রমিকের অভাব দেখা যায়।

কলস সেচ প্রযুক্তির কার্যপ্রণালীঃ

- একটি সাধারণ আকারের মাটির কলস সংগ্রহ করতে হবে।
- কলসের নিচে ড্রিল মেসিন দ্বারা বল পয়েন্ট কলমের আকারে (পরিধি আনুমানিক ২.২ সেমি) ছিদ্র করতে হবে এবং ঐ ছিদ্রে দেড়-দুই হাত পাট শক্ত করে প্রবিষ্ট করতে হবে।

- পাটযুক্ত কলসটিকে মাদার মাঝখানে এমনভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্রগুলি ও পাটের আঁশ মাটির নিচে থাকে।
- কলসের চারপাশে ৩-৪ টি বীজ বপন করতে হবে। তাহলে কলসের চারপাশে চারা গজাবে।

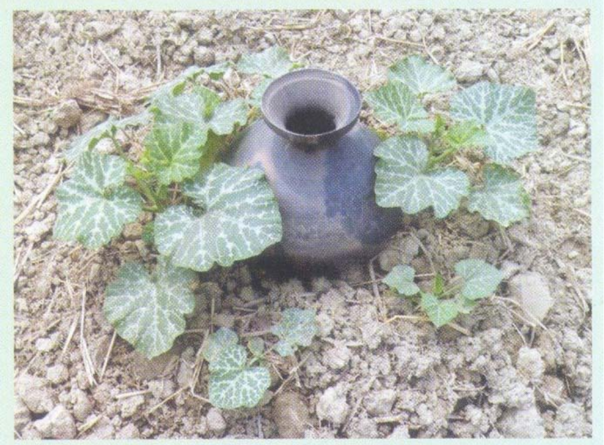

- কলসের ছিদ্রের সাথে সংযুক্ত পাট ধীরে ধীরে পানি বহন করে নিয়ে গাছের গোড়ায় সরবরাহ করবে। এতে মাদা সবসময় ভিজে থাকবে। ফলে মাটির নিচ স্তর থেকে মাদা এলাকায় (গাছের শিকড় সংলগ্ন এলাকায়) লবনযুক্ত পানি উঠে আসবে

না এবং এর ফলে মাদা এলাকায় লবণাক্ততার পরিমাণ কম থাকবে। সেই সাথে গাছ পর্যাপ্ত পানি ও খাদ্য উপাদান আহরণ করতে পারবে এবং গাছ সতেজ থাকবে।

- কলস সেচ পদ্ধতিতে মাদার লবণাক্ততার পরিমাণ ২.০ থেকে ২.৫ ডিএস/মি পর্যন্ড় কমিয়ে রাখা সম্ভব। লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণায় দেখা গেছে, শুকনো মৌসুমে প্রচলিত পদ্ধতিতে মাদায় সেচ প্রদান করলে যেখানে লবণাক্ততার পরিমাণ ৮.০ থেকে ১২.০ ডিএস/মি এর মধ্যে থাকে, সেখানে কলস পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করলে লবণাক্ততার পরিমাণ ৫.৫ থেকে ৬.৫ ডিএস/মি এর মধ্যে রাখা সম্ভব। এ মাত্রার লবণাক্ততায় মাদা ফসল চাষ করা সম্ভব।

অর্থনৈতিক হিসাব (ফসল-কুমড়া, জাত-সুইটি):

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপণা ও গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণায় দেখা গেছে কলস পদ্ধতিতে সেচকৃত একটি মাদা থেকে প্রায় ৩০ কেজি কুমড়া উৎপাদন সম্ভব। প্রতি কেজি কুমড়া ৮ টাকা কেজি দরে মাদা প্রতি বিক্রয় মূল্য ২৪০ টাকা।

কলস, সার, কীটনাশক,পানি ও শ্রমিক খরচ মাদা প্রতি ১২৫ টাকা। অতএব মাদা প্রতি লাভ (২৪০-১২৫)=১১৫ টাকা।

অন্যদিকে প্রচলিত সেচ পদ্ধতিতে সেচ কৃত একটি মাদা থেকে প্রায় ১৮ কেজি কুমড়া উৎপাদন সম্ভব। প্রতি কেজি কুমড়া ৮ টাকা কেজি দরে মাদা প্রতি বিক্রয়মূল্য ১৪৪ টাকা।

সার, কীটনাশক, পানি ও শ্রমিক খরচ ৯৫ টাকা। এ ক্ষেত্রে মাদা প্রতি লাভ (১৪৪-৯৫) = ৪৯ টাকা।

এছাড়া একটি কলস সাবধানে ব্যবহার করলে কমপক্ষে দুই বছর ব্যবহার করা সম্ভব।

খামার পুকুর প্রযুক্তি

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ২৮.৬ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় এলাকার মধ্যে প্রায় ১০.৫৬ লক্ষ হেক্টর এলাকা বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ত কবলিত। এই লবণাক্ততার কারণে শুকনো মৌসুমে বিশেষ করে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে ফসল চাষ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ সময়ে মাটির লবণাতক্তা ৮.০ ডিএ/মি এর উপরে চলে যায়। এছাড়া এই সময়ে নদীর পানির লবণাক্ততা ২৫.০-৩০.০ ডিএস/মি পর্যমত্ম লক্ষ্য করা যায়। আবার এই এলাকার খালগুলো পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় শুকনো মৌসুমে ফসল চাষের নিরাপদ পানির সংস্থান কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই শুধুমাত্র মাটি ও পানির লবণাক্ততার কারণে এ এলাকায় বোরো ধান চাষসহ অন্যান্য সবজি চাষ সম্ভব হয় না। লবণাক্ততার পাশাপাশি এ এলাকার আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো মন্দ নিস্কাশন ব্যবস্থা। অর্থাৎ জমিতে সময়মতো ''জো'' আসে না। তাই ইচ্ছা থাকলেও এ এলাকার কৃষকেরা রবি ফসল চাষ করতে পারেন না। এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শুকনো মৌসুমে সীমিত আকারে তিল ও মুগডালের চাষ হয়ে থাকে। তবে দেরীতে বীজ বপনের ফলে, দেরীতে ফল পরিপক্ক হয়। অর্থাৎ তিল ও মুগডাল ঘরে তোলার আগেই বর্ষার পানিতে নষ্ট হয়ে যায়। এসব সমস্যা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র গবেষণা করে চলেছে। লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লবণাক্ততা কমিয়ে রেখে এবং সময়মতো জমিতে জো'' আনার পরিবেশ সৃষ্টি করে এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে শুধু একটি ফসল চাষ হয়, সেখানে আরও দু'টি বা তিনটি ফসল চাষ করা সম্ভব। লবণাক্ত মাটিতে যদি নিরাপদ (মিষ্টি) পানি সেচের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়, তাহলে ঐ মাটির লবণাক্ততা কমে যায়, ফলে সেখানে সহজেই ফসল চাষ করা সম্ভব হয়। এছাড়া, কোনও জমির মাটি যদি উঁচু করা সম্ভব হয়, সেখানে সময়মতো ''জো'' আসবে এবং রবি ফসলও চাষ করা সম্ভব হবে। তাই, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র এই সব বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে উদ্ভাবন করেছে ''খামার পুকুর প্রযুক্তি''। এই ''খামার পুকুর প্রযুক্তি''র মাধ্যমে জমির লবণাক্ততা কমিয়ে এবং সময়মতো ''জো এনে বছরে ২/৩ টি ফসল চাষ সম্ভব।

খামার পুকুর প্রযুক্তি কীঃ

খামার পুকুর প্রযুক্তি এমন একটা প্রযুক্তি যাতে উপকূলীয় এলাকায় একটি খামারের মধ্যে পুকুর কেটে ঐ পুকুরে বর্ষাকলের পানি জমিয়ে রেখে সেই পানি দিয়ে শুকনো মৌসুমে ফসল চাষ করার প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তিকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রযুক্তিও বলা হয়।

নির্মাণ প্রণালীঃ

- কোনও একটি জমির পাঁচ ভাগের একভাগ জমিতে মোটামুটি ৬-৭ হাত গভীরতার ১ টি পুকুর খনন করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে।
- জমির যে অংশটা অপেক্ষাকৃত নীচু সে অংশে পুকুরটি খনন করতে হবে।
- পুকুরের চারদিকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে হবে, যাতে পানি আগমন ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বাঁধের উচ্চতা হবে দুই থেকে আড়াই হাত ও প্রস্থ হবে তিন থেকে চার হাত।
- অবশিষ্ট মাটি দিয়ে ঐ জমির বাকী চার ভাগ ভরাট করতে হবে। এতে জমিটা প্রায় ১ হাত উচুঁ হবে । ফলে ঐ জমির নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং রবি মৌসুমে সময়মত জো আসবে এবং বীজ বপন করা সম্ভব হবে। যেটা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না সময় মত জো না আসার ফলে ।

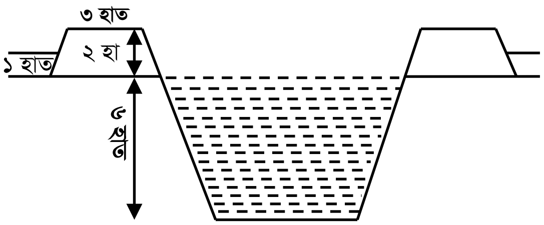

- জমিতে মাটি এমনভাবে ফেলতে হবে যাতে উপরের মাটি উপরে থাকে। কারণ উপরের মাটিতে পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে। কোনও ভাবেই নিচের মাটি যেন উপরে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- উপকূলীয় অঞ্চলের কোথায়ও কোথায়ও কষ মাটির উপস্থিতি আছে । এরূপ ক্ষেত্রে ভাল ফলাফল পাওয়ার জন্য ফসল আবাদ/মাছ চাষ উভয় ক্ষেত্রেই চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে ।
- এছাড়া, মাঠের চারিদিকের পাড়/বাঁধ দিতে যাতে বর্ষাকালে মাঠের অতিরিক্ত পানি সহজে পুকুরে এসে জমা হতে পারে।
- ভূমির নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য জমিটিকে ভালভাবে সমতল করতে হবে। এতে করে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যাবে। যাতে করে সর্বত্র উদ্ভিদের পানি ও পুষ্টি উপাদানের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা হবে।
- এছাড়া ঐ জমির লবন নিচে চুইয়ে যাবে।

কয়েকটি খামার পুকুর প্রযুক্তির লেআউটঃ

চিত্র-২: খামারের মধ্যে পুকুর

চিত্র-৩: খামারের কোনায় পুকুর

চিত্র-৪: খামারের পাশে পুকুর

খামার পুকুর প্রযুক্তির সুবিধাঃ

- লবণাক্ত এলাকায় শুকনো মৌসুমে নিরাপদ পানির উৎস হিসেবে খামার পুকুরের বিকল্প নাই।
- এছাড়া খামার পুকুর এলাকার পানি দ্রুত নিষ্কাশন হওয়ার ফলে সময় মতো রবি ফসল চাষ করা সম্ভব।
- বাঁধের উপর/পাশে শাকসব্জি/ফলজ/বনজ/ঔষধি গাছ লাগানো যেতে পারে ।
- পুকুরে মাছ চাষ /হাঁস পালন এবং উপরিভাগে মুরগী খামার করা যেতে পারে ।
- যেহেতু শুকনো মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা সম্ভব হয়, তাই একটি টেকসই ফসল বিন্যাসের মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা বাড়ানো সম্ভব।

সতর্কতাঃ

- প্রতি মাসে অন্তত: একবার পানির লবমণাক্ততা পরীক্ষা করতে পারলে ভাল হয় ।
- রবি মৌসুমে কম সেচ লাগে এমন শস্য যেমন তরমুজ, কুমড়া, উচ্ছে, ঝিঙ্গা ইত্যাদি ছাড়াও পুঁইশাক, ঢেঁড়শ চাষ করা যেতে পারে।

দুই স্তর মালচিং পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে মাটির দুই স্তরে ধানের খড় মাল্চ হিসেবে ব্যবহার করে মাটির সার্বিক লবণাক্ততা কমিয়ে আনা হয়।

(১) কর্ষণ স্তরের নীচে ধানের খড় মাল্চ স্থাপন

(২)মাল্চ এর উপর সুষম সার মিশ্রিত মাটি প্রদান.

(৩) মাদা সবজির চারা বা বীজ এই সুষম সার মিশ্রিত মাটিতে বোপন করা

(৪) মাটির উপরে গাছপালার চারিদিকে ধানের খড় মাল্চ স্হাপন

(৫) নীচে স্তর কৈশিক গতির মাধ্যমে লবণ এর ঊর্ধ্বাভিমুখী আগমন প্রতিরোধ করে ।এবং উপনরের স্তর গাছের শিকড় অঞ্চলে আদ্রতা সংরক্ষণ করে।

(৬) এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মাটির সার্বিক লবণাক্ততা কতক অংশে কমে যায়।